ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 660-669
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.055

স্যাফো সই-কথা ও কয়েকটি বাংলা উপন্যাস

ড. প্রীতম চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ, কলকাতা, ভারত*

Received: 31.12.2024; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Even though homosexuality is an ancient issue, there is still hesitation in the expression of the issue in the socio-culture or art-literature of the time. Similarly, we reach the ancient Greek island of Lesbos in search of the source of female homosexuality, but the subject is largely ignored in contemporary social thought. But its existence is strongly present in human society. A few selected novels of Bengali literature based on such thought are reviewed; Along with that, the importance and acceptance of the issue in the society has also been shed light. There are eight novels in chronological order — 'Jadubangsho' by Bimal Kar, 'Jara Bristite Bhijechilo' by Joy Goswami, 'Chander Gaaye Chand' by Tilottama Majumdar, 'Abhijyan' by Nabaneeta Devasen, 'Anuprobesh' by Trishna Basak, 'Prem Samokami' by Himadrikishor Dasgupta, 'Biscuit' by Tanwi Halder and 'Sab Path Brittakar' by Ushasi Chakraborty. The novels discuss not only the representation of lesbianism in fiction, but also the evolution of attitudes towards the subject in society.

Keywords: Homosexuality, Homosexuality, Lesbianism, Character, Social-Reform-Culture-Evolution.

'কোন পুরাতন প্রাণের টানে…': 'গঙ্গাজল', 'বকুল ফুল' সই-কথা পেরিয়ে 'কল্লোল'-এর পাতায় এলো 'ঝরা ফুল'; মেয়েদের বিকল্প যৌনতার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সমপ্রেমের একটা ছবি ধরা পড়েছিল সেখানে। অবশ্য তার আগেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রিয়তম' গল্পে দুই সখী প্রিয়তমা-তরঙ্গিনীর নিবিড় বন্ধুতা দেখেছি। পরবর্তীকালে বাংলা ছোটগল্পে নারীর বিকল্প যৌনতার আভাসটি উজ্জ্বল হয়েছে কমলকুমার মজুমদারের 'মল্লিকা বাহার' বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বুটকি ছুটকি'তে। বাণী রায় তো 'স্যাফো' নামেই গল্প লিখেছিলেন। নারীর বিকল্প-যৌনতার উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হয় খ্রিস্টজন্মের ২০০ বছর আগে গ্রিসের 'লেসবস' দ্বীপে, যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন 'প্রেম ও ঈর্ষার কবি' স্যাফো, যাঁর কবিতায় ছিল 'সমকামিতার বার্তা'— 'নারীর প্রতি নারীর ভালোবাসার গান।' সেই মিথ আশ্রয় করে 'লেসবিয়ান' শব্দের উদ্ভব। এমনকি কলকাতায় সমকামী মেয়েদের সহায়ক গোষ্ঠী হিসেবে 'স্যাফো' সংগঠনও তৈরি

হয়েছে। ২০১২ সালে এই সংগঠন সম্পর্কে উষসী চক্রবর্তী লিখেছিলেন— 'চারজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নিয়ে টিমটিম করে প্রান্তিক অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা স্যাফো এখন অতীত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আসা মেয়েদের নিয়ে স্যাফোর সদস্য সংখ্যা ৩০০। ... ৬৫০ স্কোয়ার ফুট অফিসে যথেষ্ট দৃশ্যমানতা নিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে প্রস্তুত থাকেন স্যাফোর সদস্যরা। তৈরি হয়েছে 'স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি'। প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের পরিবার ও সমাজের চক্ষুশূল, সমস্যার উৎস ভেবে গুটিয়ে থাকা, আত্মবিশ্বাস-হীনতায় ভোগা একদল মেয়ে নয়, স্যাফো এখন আত্মপরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতি (Identity politics) এবং হেটেরোনরমেটিভিটি (Heteronormativity)-র বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং করতেই থাকা একদল লড়াকু মেয়ের দল, কিছুতেই হার না মানা একটা দক্ষ সংগঠন।'[১]

'তোদের আছে মনের কথা...': সমকামিতা (যদিও 'সমপ্রেম' বলাই কাঙ্ক্ষিত) বিষয়ষয়টিকে সমাজ সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করলেও এ-ব্যাপারে এখন কম-বেশি সচেতন অনেকেই। এইসব ঘটনা বা পদক্ষেপ সাম্প্রতিক হলেও মেয়েদের বিকল্প যৌনতার জায়গাটি ছিলই। বিশ-শতকের বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখবো শিবরাম চক্রবর্তীর 'ছেলে বয়সে' (যেখানে কিশোরদের বিকল্প যৌনতার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল)-র মতো উপন্যাস কিন্তু মেয়েদের নিয়ে লেখা হয়নি। একমাত্র ছ'য়ের দশকের পটভূমিতে বিভ্রান্ত সময়ের বিক্ষুব্ধ যৌবন আশ্রয় লেখা উপন্যাস বিমল করের 'যদুবংশে' বিষয়টি এসেছিল। সূর্যর দূর-সম্পর্কের মাসি মালা— যদিও তাকে 'মালাদি' বলে ডাকে কিংবা সম্বোধন এড়িয়ে যায় সে। মালা চাকরি করে— একই বাড়িতে তার সঙ্গে থাকে অধ্যাপিকা জয়ন্তী। ঘরের বাইরে থেকে সূর্য মালা ও জয়ন্তীর যে বাক্যালাপ শুনেছিল, তা শুধু তাদের সমকামী সম্পর্কের ইঙ্গিত নয়, স্পষ্ট প্রমাণ রাখে।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত উপন্যাসে সমকামিতা প্রসঙ্গ একালের পাঠককেও চমকিত করে। শরীর নিয়ে খেলার পাশাপাশি সূক্ষ্ম মান-অভিমানও লেগে থাকে মালা ও জয়ন্তীর মধ্যে। দুই স্বাবলম্বী নারীর এই যৌথ-যাপন সমাজের প্রতি এক তীব্র বিদ্রোহও বটে। আর সূর্য বা সূর্যের মতো ছেলেরা, যাদের কাছে নারীদেহ মাত্রই পুরুষের ভোগের সামগ্রী, তারা মেয়েদের এতখানি যৌন-স্বাধীনতা সহ্য করতে পারবে কেন! তাই স্বপ্নে দেখে— 'মালাদি আর জয়ন্তী জড়াজড়ি করে তার চারপাশে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে আর সূর্য হাতে তালি মারছে, ক্লাউনের পোশাক তার। সূর্য ছড়ির বেঁকানো মাথা দিয়ে একবার এর গলাটা টেনে এনে চুমু খাচ্ছে, একবার ওর গালে। ওরা সূর্যকে শুধু হাসাচ্ছে। অবশ্য শেষে সূর্য দেখেছিল মালাদি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে শরবত খেতে দিল, শরবতটা সূর্য খেল না, না খেয়ে মালাদির বুকে ঢেলে দিল, দিতে ব্লাউজ ভিজে গিয়ে ব্লটিং পেপারের মতো চুপসে গেল। ঠাস করে চড় মারল মালাদি, সঙ্গে সঙ্গে সূর্য মালাদির পেছনে এক লাথি।' মনে রাখতে হবে, বিমল কর, মালা বা জয়ন্তীর মধ্য দিয়ে গভীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব তুলে ধরতে চাননি; বিশেষত মালার আচার-আচরণ, ভাষা প্রয়োগ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও নানা ইঙ্গিতে তার চারিত্রিক বিকৃতিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

'রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মনপ্রাণ': বিশ শতকের একেবারে শেষে প্রকাশ পেয়েছিল জয় গোস্বামীর কাব্যোপম উপন্যাস- 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' (১৯৯৮)। শুরুতেই কবি-ঔপন্যাসিক জানিয়েছিলেন— 'সে বড় নিকট কথা যা বর্ণনা করি—/ কিছু বলবো ধীরে আস্তে, কিছু তড়িঘড়ি।' সমাজ-প্রতিবেশ, প্রেম-প্রবৃত্তির টুকরো টুকরো জল-ছবির মাঝে কবির চোখে পড়েছিল রমণরতা দুই নারীমূর্তি; সম্পাদিকা ও পাঠিকা— 'একটি চাদর দুটি মনুষ্যমূর্তি/ জড়ায় পিণ্ড তালগোলাকার হয়ে/ ছটফট করে, নিঃশ্বাস সে ঝড়/ ফিসফিস

কথা দাঁতে দাঁত চেপে রাখা/ যেন কষ্টের আওয়াজ রিলিজ করে/ উপর্যুপরি দুবার।' মধ্যরাতের 'আলতো আর্তনাদে'র পর 'দুই সখী দুজনাকে/ জড়াজড়ি করে এঁকেবেঁকে শুয়ে' থাকে। কবির উপস্থিতিতেও দুই রমণী নিজেদের 'দমন' করতে পারেনি— চায়ওনি। এ নিয়ে কবির প্রাথমিক বিবমিষা জাগলেও উপন্যাসে তা আলাদা আবর্ত সৃষ্টি করেনি।

'তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও...': 'ফোঁস ফোঁস জোরে নিঃশ্বাসবায়ু' আর 'ফিসফিসে কথা'— সম্পাদিকা আর পাঠিকার জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি, কারণ তাদের সামাজিক অবস্থান ও স্বাবলম্বী জীবন। কিন্তু এই ঘটনা যখন কলকাতার হোস্টেল জীবনে ঘটে তখন দেবরূপা-শ্রেয়সী এবং তাদের রুমমেট শ্রুতির ভবিষ্যৎকেও বেপথু করে দেয়— উপন্যাস তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' (২০০৩)। ছাত্রী-আবাসে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল দুই কিশোরী দেবরূপা আর শ্রেয়সী। নিছক মানসিক বন্ধুতা বা সখীত্ব মাত্র নয়, দৈহিকভাবে কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা। আর তাদের কৃতকর্ম নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিল সায়েন্স ছেড়ে দর্শনে অনার্স পড়তে আসা শ্রুতি। সাম্মানিক-বিষয়ের তত্ত্বের আড়ালে আরো এক ভিন্ন অনুভূতি মনে সঞ্চারিত হয়ে চলেছিল তার। তথাকথিত 'পুরুষালী ছাঁদে'র দেবরূপাকে বিশেষ পছন্দ না করলেও বীরভূম থেকে আসার শ্রেয়সী ছিল তার চোখে 'আলোক ঝরানো মেয়ে'; বীরভূমের লাভপুরে স্কুল জীবনের শ্রেয়সী পেয়েছিল দময়ন্তীকে, কিন্তু তার কলকাতায় চলে আসায় অভিমানে 'কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল' দময়ন্তী। তাকে ভুলে শ্রেয়সীও পেল দেবরূপাকে— 'ছেলেদের মত করে ছাঁটা ছিল চুল। গড়নে শীর্ণ বলা যায়। চোখে পড়ার মতো কোনো সৌন্দর্যই তার ছিল না।' আর শ্রুতির চোখে পড়ছিল 'টুকরো টুকরো কিন্তু অমোঘ' কিছু দৃশ্য— হাত ভাঙা দেবরূপাকে স্নানে কিংবা অন্তর্বাস পরতে শ্রেয়সীর সাহায্য কিংবা খাওয়ার সময় মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে দেওয়া। সুন্দরী শ্রেয়সীর জীবনে শুভ্রনীলের আগমনেও বিরক্ত দেবরূপা। উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুতপা ভট্টাচার্য লিখেছিলেন— 'যৌন-সম্বন্ধ যে নারী-পুরুষেই হতে হবে— এও তো সমাজ-প্রতিষ্ঠানের গড়ে-তোলা নিয়ম। যে নিয়ম মানুষই রচনা করেছে, প্রকৃতি নয়। এক ছাত্রী আবাসনে দেবরূপা-শ্রেয়সীর শরীরী প্রেম জমে ওঠে আর প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আবাসনের সমস্ত ছাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠে। ফলে তারা বিতাড়িত হয় ছাত্রী আবাস থেকে। আখ্যানের পরবর্তী অংশে দেবরূপার সঙ্গে এক মেয়েলি ছেলে ললিতার মিথুন কলার দৃশ্যও থাকে। এই প্রেম-দৃশ্যের ভিন্ন লৈঙ্গিকতায় বুঝিয়ে দেয় সমাজ যে লিঙ্গ (Gender) রচনা করে, সে কত কৃত্রিম, শারীরিক কিংবা প্রাকৃতিক যৌনতার থেকে তা কতই পৃথক।'[২]

সেদিন শ্রেয়সী ও দেবরূপার সঙ্গে বিতাড়িত হয়েছিল শ্রুতিও। অভিযুক্ত হয়েছিল 'ভয়ার' হিসেবে। তিনটি মেয়েরই সমকামিতার অপরাধের পড়াশোনায় ঘটে গেছে চরম ক্ষতি। দেবরূপা ও শ্রেয়সীর কাহিনি মূলত উপন্যাসের প্রথম পর্ব জুড়ে থাকলেও ক্লাসিক ভঙ্গির এই রচনার কেন্দ্রে লেখিকা শ্রুতিকেই রেখেছেন (উপন্যাসের স্পষ্ট দুটি পর্ব আছে 'পূর্বশ্রুতি' এবং 'পরশ্রুতি' নামে)। তার চোখ দিয়েই দেখিয়েছেন বিকল্প যৌনতাকে— 'যৌনতার নজির' চারপাশে। সুতপা ভট্টাচার্য তিলোত্তমার উপন্যাসে 'সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন' করা 'যৌনআকাঙ্ক্ষা'র উপস্থাপনের দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাইতো শাস্ত্রে লেখা নরনারীর প্রেমের বাইরে গিয়েও দেখা যায়— 'নারীতে নারীতে প্রেম সখীত্ব হয়েছে/ নরকে নরতে প্রেম সখা নাম পেল/ হে সখা হৃদয়ে রহ হৃদি দগ্ধ হলো।'

উপন্যাসের শেষে নারীবেশী ললিতার সঙ্গে দেবরূপার মিলনদৃশ্য দেখে শ্রুতির মনে পড়ে শ্রেয়সীকে, তার 'তলপেট টনটন' করে ওঠে। অনুভব করে নিজের বিকল্প যৌনসত্তা— 'আমার শরীর জুড়ে আশ্চর্য অনুভূতি। আমার, ওইরকম দেবরূপার মতো, কাচুঁলি ভেদ করতে ইচ্ছা করছে! আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে! হে ঈশ্বর, এর নাম যৌন অনুভূতি! হে আশ্চর্য, আমি কি নিজেকে চিনতে পারছি! হে ঈশ্বর, আমি ওদের ঘোর ভাঙিয়ে দিলাম না কেন? সে কি এজন্যই যে আমি যা পারি না, দেবরূপা যা পারে, তা প্রত্যক্ষ করে আমার সুখানুভূতি হচ্ছে!' সমকামিতার প্রতি তার 'ভয়', 'ঘেন্না' সবই ছিল বাহ্য উপলব্ধি। সেই কারণে বনা মিশ্র বা মিত্রা নাথ কুড়ি নম্বর রুম ত্যাগ করলেও শ্রেয়সী-দেবরূপাকে ছেড়ে যায়নি শ্রুতি। 'ভরন্ত' কোপাই আর 'শীর্ণ' ইছামতীর মিলন চেতন-অবচেতনে উপলব্ধি করে চলেছিল— 'শ্রেয়সী ও দেবরূপার সমস্ত সক্রিয়তার উদাহরণ সে পেয়ে যাচ্ছিল একে একে।' মধ্যরাতে জ্বেলে ফেলা হঠাৎ আলোয় দেখেছিল 'দুখানি গোল চাঁদ যেন-বা যুক্ত হয়ে আছে এবং উপুড় করা ঘোলাটে সে চাঁদে পাঁচ পাঁচ দশ খানি আঙুল যেন বাজাচ্ছে মৃদঙ্গম।' তবুও প্রতিবাদী সভায় (যেখানে অনেক মিথ্যা অভিযোগ যুক্ত হচ্ছিল) শ্রেয়সী বা দেবরূপার দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলে কিংবা বনার স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সাড়া না দিয়ে মাধ্যমিকে স্টার আর উচ্চমাধ্যমিকে ৭১৪ পাওয়া শ্রুতি দর্শনের অনার্স পাবার সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেড়-হাজার টাকার এনজিওর চাকরির হাতে তুলে দিয়েছিল নিজের ভবিষ্যৎ।

'মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে...': নবনীতা দেবসেনের 'বামাবোধিনী' উপন্যাসে সঞ্জয় আর রবির মধ্যে তৈরী হয়েছিল বন্ধুতর এক সম্পর্ক। সে সম্পর্কের মাঝে দাঁড়িয়ে রবি বলতে পারে—'ওর চোখের দিকে তাকালেই আমি বুঝতে পারি, আমি ওর। আমার যা কিছু সমস্তই ওর।' কেবল বোঝেনি তাদের পত্নীদ্বয়— অংশুমালা আর মালিনী। সমাজে খোলা বাতাস কম, 'বোম্বে দোস্ত'এর মতো পত্রিকা তখনও কলকাতা থেকে বেরোনো সম্ভব ছিল না। তবু নিজেদের প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেনি রবি-সঞ্জু। কারণ তারা জানে তথাকথিত সমাজের কাছে 'সমকাম' মানেই 'কাম'। শুধু 'কাম'ই নয়, 'বিকৃত কামনা'। প্রেমের অবস্থানকে সেখানে কেউ স্বীকারই করে না। সেই পরিস্থিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে তারা। রবি ও সঞ্জয় পরস্পরকে ভালোবাসে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে একসঙ্গে থাকার। কিন্তু অংশু বা মালিনীর মতো একনিষ্ঠ প্রেম কি ছিল তাদের? এ প্রশ্নের উত্তর 'বামাবোধিনী'তে পাওয়া যায় না। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে নবনীতা এই উপন্যাসের এক উপসংহার রচনা করেছিলেন 'অভিজ্ঞান' (২০০৯) নামে। মাত্র সাতদিনের মধ্যে লেখা উপন্যাসে 'আধুনিক নারী জীবনের কয়েকটা বড় সমস্যাকে ধরতে' চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। 'সেফ সেক্স প্র্যাকটিস' করেও শেষ রক্ষা হয়নি, সেখানে দেখা গেছে 'কোনও এয়ার নাইট স্ট্যান্ডের খেসারত' দিয়ে এইচ.আই.ভি আক্রান্ত হয়েছে রবি। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে গেছে সে, পল নামে এক সঙ্গীকেও পেয়েছে সেখানে। 'অভিজ্ঞান'-এ অংশুমালা মলয়-পত্নী হয়েও নিজের কাজ-কর্ম, লেখা-লেখি নিয়ে সক্রিয়, এমনকি সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক ভাবনায় সব সময় সচেতন। গে-রাইটসের দাবী নিয়ে মিছিলেও হাঁটেন। তবু দশক পেরিয়ে সাহিত্যে জগতে মেয়েদের অবস্থান কিন্তু বদলায়নি। মালিনী জেরি সিং-এর সঙ্গে নতুন করে সংসার পেতেছে। আর পুষ্পা রয়ে গেছে মাসি অংশুর কাছেই। আপাতভাবে বাবার উত্তরাধিকার বলে মনে হলেও অতি স্বাভাবিক নিয়মেই পুষ্পা বা পুষ্পাঞ্জলির মধ্যেও দেখা দিয়েছে সমকামিতা বা উভকামিতা (যদিও বলা হয় সমকামী পুরুষের সমকামী মামা থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন কিছু প্রমাণ হয়নি।) প্রেমিক সৌম্যকে রোহিণীর হাতে ছেড়ে সে চলে গেছে সালমার দিকে। স্বাধীনচেতা এবং আধুনিক মানসিকতার অংশুমালাও

পুষ্পাকে প্রথমদিকে স্বচ্ছন্দে সমর্থন করতে পারেনি, পেরেছে পরে। তবে আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে পুষ্পাকে; সালমার স্বামী অনীশ তাকে ভোগ করতে চেয়েছে, 'তুমি আমার বউয়ের প্রেমিকা, অতএব তুমি আমারও প্রেমিকা। অ্যান্ড হি... অ্যান্ড হি...'

দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর মতো তাকে বেআব্রু করেছিল অনীশ। কিন্তু অনীশ ছাড়াও আছে পুষ্পার প্রায় বাল্য-বয়সের প্রেমিক 'ইন্টেলেকচুয়াল' নবীন ফিল্মমেকার সৌম্য, যে নিজেকে 'বিশ্রী রকমের হেটেরো' বা 'বিশ্রী রকমের হোমোফোবিক' বলেছে। 'মেল টাচ সহ্য করতে' না পারলেও প্রেমিকার 'ওরিয়েন্টেশন' বুঝে নিয়ে বলতে পারে— 'আসলে অনেক মানুষই বাইসেক্সুয়াল হয়, সেটা অস্বাভাবিক কিছুই না। পুষি, আমার মনে হচ্ছে তুই-ও বাইসেক্সুয়াল। আমাকেও খুব ভালবাসিস, আই নো উই হ্যাভ আ গ্রেট টাইম ইন বেড, কিন্তু আমাদের তো অনেক কালের বাল্যপ্রেম? মিইয়ে যাচ্ছে। এটা নতুন, খুব রোমান্টিক, এতে নতুন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডেড হয়েছে, নতুন নতুন ডিসকভারি থাকতে পারে, গিল্ট আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে, অনীশকে ঠকানো আছে, আমাকেও অল্পবিস্তর, সেম সেক্সের রিলেশনশিপে গোপনতা আছে, সামাজিক বাধা আছে, সেই বাধা লঙ্ঘনে আনন্দ আর ভয় আছে— মোট কথা এই সবে প্রচুর উত্তেজনা আছে...'। বাবরি-মসজিদ থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম— সমকালীন নানা বিষয় থাকলেও নেতি-ইতির নানা প্রসঙ্গ পেরিয়ে এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে পুষ্পা ও সালমা। শেষ পর্যন্ত লেখিকা আন্তরিক সহানুভূতি ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দুই-নারীর ভালবাসাকে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়ে সমর্থন করেছে।

'বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে...': তৃষ্ণা বসাকের 'অনুপ্রবেশ' (২০১৬) উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে সমকালের সঙ্গে ষাটের দশকের হাংরি আন্দোলন থেকে বিদ্যাপতির যুগ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। প্রেম-বিরহ-মান-অভিমানের সঙ্গে যেমন চেতন-অবচেতনকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন, তেমনি হিংসা-ঈর্ষা-আক্রোশের সঙ্গে মাসল টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যান্ট-এর মতো বিষয় চলে আসে। আর 'পেশি খুঁড়ে' বেদনাবহ স্মৃতির সন্ধান পেয়েছিল অতি সাধারণ চাকুরে রঞ্জন; 'নীতি প্রিয়দর্শিনী' নামের আড়ালে রয়ে গিয়েছিল যথাক্রমে দুই নারী— অবন্তিকা ও রঞ্জু। তাদের সম্পর্কের আড়ালে বয়ে চলেছিল সমকামী-সত্তা। রঞ্জুর বাড়ি ধূলিসরাইয়ে আর অবন্তিকা থাকত সীতাপুর। উপন্যাসের স্থান-পটভূমিতে কলকাতার সঙ্গে মিশে গেছে বিদ্যাপতির মিথিলা বা ষাটের দশকের বিহার; কলকাতার মধ্যবিত্ত সংসারের পাশে এসেছে মৈথিল 'ঝা' পরিবার।

সেই প্রতিকূল পরিবেশেও দুই নারী নিজের অনুভূতিকে চেপে রাখতে পারেনি। 'ভেতরের কথাটা' নিজেদের কাছে স্পষ্ট হলেও 'অর্থোডক্স' পরিবার থেকে আড়াল করে রেখেছিল অয়ন্তিকা। 'একটু রুক্ষ পুরুষালী' চিত্রকর রঞ্জু গ্রামের মধুবনি শিল্পীদের নিয়ে নতুন আর্ট ফর্ম তৈরি করছে; কবিতাও লেখে; 'মাসের পর মাস পড়ে থাকে গ্রামে। ওকে পায় কোথায় অবন্তিকা? মাঝে মাঝে ঝড়ের মতো হাজির হয় আর ওকে তছনছ করে চলে যায়।' বিরহ বেদনা তৈরি হয় দুই নারীর, শরীরী মিলনের অতল সমুদ্রে যার সমাপ্তি ঘটে।

দুই নারী চরিত্রে আছে বৈপরীত্য— অবন্তিকা নরম স্বভাবের, ফিউডাল পরিবারের বেষ্টনী থেকে বিচ্যুত হতে পারেনি। রঞ্জু ছুটে বেড়ায়, ঈশ্বর নয় মানুষের প্রতিই তার ভরসা; কবিতা লিখতে জানলেও কবিতা আন্দোলনের গিমিকে ঢুকতে চায়নি— '...আমার কাজ মাটির কাছের মানুষদের জড়িয়ে, ওসব শৌখিন কবিরা যেন আমার থেকে দূরে থাকে।' কিন্তু দূরে থাকেনি কবিরা, কলকাতার হাংরি আন্দোলনের কবি

সমীরণ চৌধুরী বা বিহারের ডাক্তার-কবি বিলোল প্রসাদ ঝা'য়ের পুরুষ প্রবৃত্তি ধ্বস্ত করে দিয়েছিল দুই নারীর নিজস্ব যাপনকে। পুলিশের তাড়া খেয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে প্রবৃত্তির দাহ নিয়ে দুই পুরুষ যখন দেখলো অবন্তিকা-রঞ্জুর মিথুন মূর্তি, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া— '...পৃথিবীতে সবে সন্ধ্যা নামছে। সেই অন্ধকারের ভেতরের আলোয় ও স্পষ্ট দেখতে পেল রঞ্জুর শরীর অবন্তিকার শরীরে মিশে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দুজন নয়, একজনই দোল খাচ্ছে। বিলোল রাস্তায় থুতু ফেলে বলে, 'আরে কত দেখলাম। নরুয়ায় চল একবার। এত রূপ একটা মেয়ের ভোগে লাগতে দেব, বুরবক পাওনি আমায়।'

বিলোলপ্রসাদ ঝা ধর্ষণ করেছিল রঞ্জুকে, প্রত্যক্ষদর্শী অবন্তিকা খুন হল তারই হাতে। আর 'অপমানে আত্মহত্যা করল রঞ্জু। সে ছিল শরীরে মেয়ে, অন্তরে পুরুষ। নিজের এই পরিণতি সে মেনে নিতে পারেনি।' কবি সমীরণ চৌধুরীও এই ঘটনায় কোনো প্রতিবাদ জানায়নি, 'নেপাল বর্ডার পেরিয়ে' চলে গেছে সুন্দরী কবি পারিজাতের কাছে। অতএব দুই অপরাধী পুরুষ 'একজন নেপালে, একজন মুম্বাইতে। সমাজের দুজন সম্মানিত পুরুষ। আর দু-দুটো মেয়ে যে মরে গেল।' না, সে নিয়ে কোনো সাড়া পড়েনি, একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা বৃদ্ধ কবি সমীরণ চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া— 'ওদের সমাজ ওদের এমনিতেই মারত। ওরা ছিল সমকামী। তার ওপর বিদ্যাপতিকে নিয়ে এমন একটা উপন্যাস লিখেছিল যে ওদের কিছুতেই বাঁচতে দিত না। দেখবেন সাহিত্যের ইতিহাসে ওদের কোথাও কোনো উল্লেখ নেই।'

মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস রঞ্জু বা অবন্তিকাকে মুছে দিলেও কবি বিদ্যাপতি, লখিমা, রাধা, শিবসিংহ এমনকি জানকীও ধরা দিয়েছিল অবন্তিকার কলমে— 'অবন্তিকা একটা অন্যরকম লেখা লিখছে। কবিতা নয়, উপন্যাস। আর তার প্রধান চরিত্র একজন কিংবদন্তি কবি। আর দুটি প্রধান নারী চরিত্র, যাদের একজনকে নিয়ে কবি অনেক কবিতা লিখেছেন আর একজনকে নিয়ে কিচ্ছু না। আশ্চর্য ব্যাপার হল, নারী চরিত্র দুটি একই সময়ের নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে একটি গোটা যুগ— ত্রেতা।' সেখানে জানকী রাধার কাছে প্রশ্ন রাখে 'সন্তানের জন্য বিবাহের কী প্রয়োজন?' জানকীর কথা জানার-বলার জন্য রাধা আকুল— 'আমিই পারব। তোমার দুই স্তন, যার মধ্য দিয়ে রামচন্দ্র বলেছিলেন, একটি সুতোও গলানো যায় না, তার নিচে একটা হৃদয় আছে, একটা মন আছে— আমি ছাড়া কে জানে তার কথা?' অরাজক দেশে দুই নারীর অপ্রতিরোধ্য-প্রেমকে পাঠক দেখলেন বিদ্যাপতির চোখ দিয়ে— '...শীৎকার ও ফিসফসের স্বর তাঁকে কিছু অবাক করে। তিনি আচমকা দেখেন ধানী রঙ ওড়না উড়ছে জোৎস্নায়, তার সঙ্গে মিশে আছে নীল শাড়ি, দুটি নারী শরীর পরস্পরকে এমনভাবে লেহন করছে যেন পৃথিবীতে ওরা অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। ... রাধা ও জানকী নদীতটে চাঁদের আলোয় আলিঙ্গনবদ্ধ।' নিজের জীবনের 'অনুচ্চারিত এবং নিষিদ্ধ' তথ্য নিয়ে অবন্তিকার এই গাথা; 'আশঙ্কা'ও আছে তার মনে 'সে শুধু সমাজের রোষেই পড়বে না, বাড়ি থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' চার দেওয়ালের আড়ালে সে লেখা পড়ে সমীরণ-বিলোলের প্রতিক্রিয়া - 'মেয়েটির সাহস আছে। বিদ্যাপতিকে হোমোসেক্সুয়াল দেখিয়েছে। শিবসিংহের সঙ্গে নাকি তাঁর প্যাশনেট সম্পর্ক ছিল। ওর তো জিভ ছিঁড়ে নেবে সবাই।' বিজ্ঞানের সমর্থন থাকলেও সমাজ তো আজও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেয়নি বিষয়টিকে। সেই স্বীকৃতি হয়তো ছ'য়ের দশকে অবন্তিকা খুঁজে ছিল বিদ্যাপতির আত্মজবানীতে—'শিবসিংহ নেই, কোথাও নেই। দূত তাঁর মৃত্যসংবাদ নিয়ে এসেছে। আর আরও একটি খবর তাঁকে সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে দিল। রাজার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চিতা জ্বেলে মৃত্যুবরণ করেছে লখিমা। তবু ভালো সে প্রকৃত সত্য জেনে যায়নি। জানলে তার হৃদয় খান খান হয়ে যেত। হায় রাজা, তাঁর হৃদয়ের রাজা। সবাই বলে তিনি লখিমার অনুরক্ত। ভেতরের কথা কেউ জানে না। তিনি তো রাজার, একান্তভাবে রাজার। নানান ছলে তার

নাম নিয়েছেন তাঁর পদাবলীতে। রাধার মতো অনন্ত বিফল অভিসার তাঁর।' আসলে রঞ্জা-অবন্তিকার 'ভেতরের কথা'ই তো সঞ্চারিত হয়েছে রাধা-জানকী বা বিদ্যাপতি-শিবসিংহের মধ্যে; দেহ থেকে যে প্রেম পৌঁছে গেছে দেহাতীতে।

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে...': রুদ্রাণী-শ্যামলীর প্রেম এবং অহনার সমকাম-আশ্রিত উপন্যাস-লেখা, এই পটভূমিতে হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের উপন্যাস প্রেম সমকামী (২০১৯)। রচনাটিতে সমকামিতা বিষয়ে দেশি-বিদেশি নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ এসেছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও যাপিত জীবনে সমকামিতায় প্রকাশগুলির স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। উনিশ শতকের অগ্রগণ্য কবি থেকে স্যার উপাধিপ্রাপ্ত বাঙালি ছাড়াও স্যাফো, সক্রেটিস, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, বায়রন, আলেকজান্ডার থেকে অস্কার ওয়াইল্ড— অনেকের জীবনেই কম বেশি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাচীনকালে সমকামিতার উপস্থিতির প্রমাণ আছে সাহিত্য থেকে ভাস্কর্যে, এসবের পরেও সমকামিতা যে একুশ শতকের সমাজেও সহজভাবে গৃহীত হয়নি, সেই চিহ্ন ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

সমকামিতার অপরাধে রুদ্রাণীকে তার দাদা বৌদি কামুক গুরুদেবের সামনে ঠেলে দিয়েছে। ধর্ষণ থেকে বাঁচলেও ভণ্ডও-গুরুর ভাঙা মদের বোতলের চিহ্ন চিরকালের মতো মেয়েটির তলপেটে আঁকা থাকে। আর শ্যামলী বিয়ের জন্য বাড়ির অত্যধিক চাপ সহ্য করতে না পেরে হার্টঅ্যাটাকে মারা যায়। শ্যামলী যদি গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে না হতো বা রুদ্রাণীর মায়ের অর্থনৈতিক ভিতটা একটু মজবুত হতো, তাহলে হয়ত তাদের নিবিড়-প্রেমের এমন করুণ পরিণতি হতো না। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন সমকামী সম্পর্কের মধ্যে মিশে থাকে কি গভীর সমপ্রেম।

সমকামের প্রতি ঘৃণা বা 'হোমোফোবিয়া'র চরম দেখিয়েছেন অহনার প্রেমিক নীল ও তার পরিবারের মধ্য দিয়ে। তথাকথিত শিক্ষিত পরিবার হয়েও বিবাহের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিভাজনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়; আইটি সেক্টরে চাকরি করা ছেলে (যার আমেরিকায় যাবার প্রবল সম্ভাবনা), সেও পরিবারেরই মানসিকতার বদল না ঘটিয়ে মাথা নোয়ায় কুসংস্কারের কাছেই। একই বাস থেকে প্রেমিকা ও দুজন হিজড়েকে নামতে দেখে হবু পত্নীকে অনায়াসে সমকামী ভেবে নিতে পারে। হিমাদ্রিকিশোর দুই নারীর প্রেমের চেয়ে সমাজের সংকীর্ণ ভাবনা আর তার কদর্য প্রতিক্রিয়াটিকে বিশেষভাবে দেখাতে চেয়েছেন। কলকাতা LGBTQ-এর বর্তমান অবস্থান কাজকর্ম যেমন কাহিনিতে আছে, তেমনি তাদের অস্তিত্বের লড়াই কেউ দেখিয়েছেন— 'এল.জি.বি.টি আন্দোলন তো প্রথম ও দেশেই (আমেরিকা) শুরু হয়েছিল। এল.জি.বি.টি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা নাগরিক মর্যাদা পায়, সব ধরনের সামাজিক অধিকার ভোগ করে। ওদেশ থেকে এল.জি.বি.টি আন্দোলন যখন এদেশে এলো তখন থেকে অনেকে বলতে শুরু করেছে আসলে এসব হল এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিকে উচ্ছন্নে দেবার মার্কিনী চক্রান্ত! এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়ও নাকি এই বৃহত্তর চক্রান্তেই অংশ।'

উপন্যাসের শেষে অহনার বাবা সহানুভূতিশীল মন নিয়ে সমকামী মানুষ ও তাদের নিয়ে মেয়ের লেখা উপন্যাসকে স্বাগত জানিয়েছেন। অহনার মনের সুপ্ত সমকামিতা বা উভগামী-সত্তা প্রকাশ পেয়েছে নীলের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হবার পর রুদ্রাণী নিবিড় আলিঙ্গনে কান্নায় ভেঙে পড়ার সময়। তাই উপসংহারে উপন্যাসকের বার্তা 'হয়তো প্রত্যেক মানুষের মনেই সমকামিতা গোপনে লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে কিছু সময়ের জন্য তা প্রকাশ পায়। প্রেম সমকামী।

'পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ...': জগদীশ গুপ্তের একটি বহু-চর্চিত গল্প 'অরূপের রাস'; রাণু-কানুর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-প্রেম-প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত ঠেকেছিল কানু পত্নী ইন্দিরা ও বিবাহিতা রাণুর একটি শরীরী মিলনের আভাসে। যদিও গল্পের নামকরণ ও মনোবিকলন পদ্ধতির দিকে তাকালে গল্পটিকে নিছক সমকামিতার গল্প বলা যায় না। বরং প্রিয় পুরুষের সঙ্গ-লিপ্সা ও অন্তরে লালিত গভীর প্রেম বা প্রবৃত্তি সমকামিতার পথ ধরে বিকল্প মুক্তির দিকে গিয়েছিল। কানুর জবানীতে গল্পের শেষে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এভাবে— 'ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। ... আমি তৃপ্ত।'[৩] তন্বী হালদারের নভেলেট 'বিস্কুট' (২০২১)-এও এক পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই নারী এভাবেই কাছাকাছি এসেছিল, কবি অংশুমান বসুর স্ত্রী অঙ্কন-শিল্পী উর্বী এবং প্রেমিকা অধ্যাপিকা ইন্দুমতী।

কাহিনির যখন শুরু, তখন অংশুমান মৃত। বোলপুর থেকে উর্বী আসছে মধ্যমগ্রামে, ইন্দুর ফ্ল্যাটে। মৃত প্রেমিকের স্ত্রীর আসার খবর পেয়ে ইন্দুমতীর মনে তৈরি হয়েছে উৎকণ্ঠা; না, কোনও বিরক্তি বা ঈর্ষা নয়, নিজেকে নিবেদনের জন্যই যেন তার প্রস্তুতি। ঘর সাজানোর পরামর্শ চেয়ে প্রায় মধ্যরাতে কলেজের সহকর্মী রেশমিকে ফোন করে তার 'রাগ বিরক্তি' তুঙ্গে তুলেছে। শুধু পর্দা বা সোফা সেটের ঢাকনা-বদল নয়, বাথরুম সারাই করাতে গিয়ে এক সপ্তাহ হাসিমুখে রাজমিস্ত্রির বাড়ির অতিথি হতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ঘর রঙ করানোর ইচ্ছেটুকু সামলে নিয়েছিল গৃহসেবিকা সুলতাদির চরম আপত্তিতে। ট্রেন থেকে নেমে উর্বীর আসার পথটুকু নিয়েও অতিমাত্রায় 'কনসার্ন' ইন্দু। উর্বীর কটাক্ষ, আঘাতের পরেও মন সেদিকেই ধায়, উর্বীর দিকে তাকিয়ে ইন্দুর 'একবুক কষ্ট টলটল করে।'

লেখিকা খুব সচেতন ভাবে দুই নারীর শরীরে আকর্ষণের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছেন। ইন্দুর চোখ দিয়ে উর্বীকে দেখিয়েছেন এভাবে—

১) 'উর্বী হাসলে বাঁ গালে টোল পড়ে। ইন্দু যেন টোলের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। পূর্বের ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সুঠাম শরীরটার দিকে তাকিয়ে ইন্দু যেন চোখ ফেলতে পারে না।'

২) 'মেরুন রঙের একটা টিশার্ট আর ঘিয়ে রঙের ট্রাউজার পরেছে উর্বী। মাথায় ইন্দুর কেনা সেই নতুন টাওয়ালটা পেঁচিয়ে রাখা।'

৩) 'উর্বী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দুর পিঠে হাত রাখলে, এতক্ষণ ইন্দু যেন নিজেকে সঁপে দেওয়ার একটা আশ্রয় পায়। উর্বীর বুকের ভেতর মুখ গুঁজে দিলে বুকের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা কান্নাটার আগল খুলে যায়।'

উর্বী এসেছিল ইন্দুকে আঘাত করতে, ব্যথা দিতে; অংশুমানের ব্যাগে রয়ে যাওয়া ইন্দুর অন্তর্বাস বয়ে এনেছিল অপমানে জর্জরিত করার জন্যই। কিন্তু সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়াতে ইন্দুমতীর জ্ঞান হারানো মানসিক এবং শারীরিকভাবে কাছাকাছি নিয়ে এলো দুই নারীকে। তৈরি হলো সম্পর্কের নতত্ন 'নকশিকাঁথা'— 'লিপলকে' বন্দী হয় দুই নারী। তারা উপলব্ধি করেছে— 'একই রকমের দুঃখে, একই রকমের অভিমানে, একই রকমের অপমানে, একই রকমের হারানোর ভয়ে তারা হাসতে ভুলে গেছিল। হয়তো বা বাঁচতেও।' দুই নারী কবি অংশুমানের শঠতার শিকার; বিশিষ্ট শিল্পী হয়ে স্ত্রীর ছবিকে নিজের আঁকা অথবা প্রেমিকার কবিতাকে নিজের বলে প্রচার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তন্বী হালদারেরই 'চিত্রাঙ্গদ' উপন্যাসটির কথা। সেখানেও কবি অর্চিষ্মান বসু সুভদ্রর হাতে মদের গ্লাস তুলে দিয়ে তার সঙ্গে

শুধু পায়ুসঙ্গমই করেননি, তরুণ কবির লেখা 'অরুন্ধতী' কবিতাটিকে নিজের কবিতা 'পরাগ' কাব্যে ছেপে দিয়েছিলেন। 'বিস্কুট' উপন্যাসে সেই মিথ্যার মুক্তি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধে 'শান্ত স্বভাবের' ইন্দুমতী এবং 'রাফ এন্ড টাফ' উর্বীকে। রণাঙ্গনের গ্রাভিয়েটর—দুই হিংস্র বাঘিনী থেকে হয়ে উঠে পরস্পরের আশ্রয়।

একটা প্রশ্ন থাকে— সম্পর্ক নির্মাণ সময়ের সংক্ষিপ্ততা নিয়ে। সামাজিক চেনা প্রেমের বাইরে বেরিয়ে সম্পর্কের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুতময়তা একটা জিজ্ঞাসা তোলেই। মনে রাখতে হবে শরীরী তৃপ্তির উল্লেখ আমরা উর্বীর সংলাপে পেয়েছি— 'একটু বেশিই নরম ইন্দুমতী'— এই তৃপ্তি হয়তো ইন্দুমতীর জীবনেও এনেছিল 'অন্যরকম চাপুরচুপুর আনন্দ'। তবে উপন্যাসের শেষে ইন্দুমতীর কলেজের ঘটনা তথা প্রিন্সিপালের সামনে 'লিভ-ইন'এর প্রসঙ্গ কিছুটা আরোপিত মনে হয়। হয়তো আয়তনের সংক্ষিপ্ততা রক্ষা করতে গিয়ে লেখিকাকে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকতার দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। কিন্তু ভাবনার স্পষ্টতা ও সম্পর্কে স্বচ্ছতায় তন্বী হালদারের 'বিস্কুট' 'টানটান জীবনের জলছবি'— যা শূন্যতা থেকে নিয়ে যায় সৃজনের দিকে, সত্যের দিকে এবং সততার দিকে।

'কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি...': ২০২১ এর 'সানন্দা' পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল উষসী চক্রবর্তীর 'সব পথ বৃত্তাকার'। কাহিনিতে প্রথিতযশা সাংবাদিক বা 'প্রায় সেলিব্রিটি' জয়িতা মজুমদারের সঙ্গে ছিল নৃত্যশিল্পী দোয়েল বসুর 'অন্যরকম সম্পর্ক'; জয়িতার মা, যাদবপুরের অধ্যাপিকা শেফালী মজুমদার মেয়ের যৌন অভিমুখ মেনে নিলেও আহিরিটোলার বসু পরিবার অর্থাৎ বাপ-মা-হারা দোয়েলের জেঠু-জেঠুমা, যাঁরা সন্তান-স্নেহে মানুষ করেছেন তাকে কিংবা 'অর্থোদক্স' পিসিঠাম্মা, তুতো-বোন কোয়েল— এদের কাছে নিজের 'ওরিয়েন্টেশন' গোপন করতে হয়েছিল নাচ নিয়ে গবেষণারত বা ডান্স থেরাপি নিয়ে চর্চা করা দোয়েলকে। যদিও স্বাবলম্বী দুই নারীর বিচ্ছেদ ঘটেছিল সামাজিক বা পারিবারিক কারণে নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। 'খবর সারাদিনে'র ডেপুটি এডিটর জয়িতার জীবনে আসা-যাওয়া করে একাধিক নারী— ঈপ্সিতা-সাবেরী-মন্দিরা। প্রেমে একনিষ্ঠ দোয়েল যা মেনে নিতে পারেনি। অভিমানে আক্রোশে ভেঙে পড়েছে। আর জয়িতার প্রতিক্রিয়া— 'বেঁচে থাকার জন্য আমার... অন্য ইনস্পিরেশন... অন্য স্পার্ক দরকার। কিন্তু তা বলে এমন নয় যে আমি তোকে ভালোবাসি না, আমি তোর সঙ্গেই থাকতে চাই ... কেন বুঝতে পারছিস না।'

দোয়েল ফিরে যায়নি জয়িতার কাছে; সমাজ সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। জয়িতাও পাড়ি দিয়েছিল বিদেশে। ধ্বস্ত-দাম্পত্যের সন্তান অ্যাগনেস লী ব্যানার্জি— তারই বন্ধুতায় ও সহায়তায় ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল দোয়েল। মণিপুরী জিম ট্রেনার অং-এর সঙ্গে লী এর বিয়ে; সেই সূত্রের তার ঠাকুরমা পূর্ণিমা দেবীর সহায়তায় জাহাজী নীলাদ্রিশেখর ও চায়না টাউনের রেস্তোরাঁর মালকিন শ্যারন— পুত্র-পুত্রবধূর পুনর্মিলন। এবং তারপরেই বিয়ের জন্য জেঠু-জেঠুমার অনুরোধ— এসবের প্রতিক্রিয়ায় দোয়েল বিনা প্রতিবাদে বিয়েতে মত দিয়েছিল। নির্বাচিত পাত্র— ধনী পরিবারের সন্তান রাহুলও সমকামী। তার স্টেডি বয়ফ্রেন্ড সুগত। এটা দোয়েলের দ্বিতীয় ধাক্কা। বাইসেক্সুয়াল দোয়েল নিজেকে ভাবে 'ফ্লুইড'— 'সেক্সুয়ালি ফ্লেক্সিবেল, পরিবর্তনশীল। স্ট্রেট, হেটেরো বা হোমো কোন ছকেই ঠিক বসানো যায় না।' শেষ পর্যন্ত রাহুল-সুগতর বাড়ির অন্য ফ্লোরে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতে গিয়ে দোয়েল হয়ে পড়েছে আরো বিষণ্ণ; পুরুষ নয়, নারীকে জীবনসঙ্গী করার কথাই ভেবেছে। লী-সুজাতা-সুগতরা উৎসাহ নিয়ে তার জন্য পাত্রী খুঁজতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। সেই নিয়ে টিভি চ্যানেলে চলেছে জোর

তরজা। টিআরপি বেড়ে গেছে মুন টিভির। সেই বিজ্ঞাপন দেখে দেশ-বিদেশের বহু নারীর সঙ্গে এসেছে জয়িতার মেল। ছোটগল্পের মত প্রশ্ন-চিহ্নে উপন্যাস শেষ করেছেন উষসী, খুলে রেখেছেন প্রেমের অনন্ত সম্ভাবনার পথ।

তথ্যসূত্র::

১. চক্রবর্তী উষসী, 'মেয়েঘেঁষা লেখারা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৫৬
২. ভট্টাচার্য সুতপা, 'মেয়েলি আলাপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১২৮-১২৯
৩. রায়চৌধুরী সুবীর (সম্পা), 'জগদীশ গুপ্তের গল্প', দে'জ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ১২৬

আকর গ্রন্থ :

১. কর বিমল, 'যদুবংশ', 'উপন্যাস সমগ্র ৩', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।
২. গোস্বামী জয়, 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।
৩. চক্রবর্তী উষসী, 'সব পথ বৃত্তাকার', শারদীয়া 'সানন্দা', কলকাতা, ২০২১।
৪. দাশগুপ্ত হিমাদ্রিকিশোর, 'প্রেম সমকামী' প্রিয়া বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯।
৫. দেবসেন নবনীতা, 'অভিজ্ঞান', দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।
৬. বসাক তৃষ্ণা, 'অনুপ্রবেশ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬।
৭. মজুমদার তিলোত্তমা, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩।
৮. হালদার তন্বী, 'বিস্কুট', সমকালের জীয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০২১।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. তন্বী হালদার, 'চিত্রাঙ্গদ', ঐহিক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১।
২. দেবসেন নবনীতা, 'বামাবোধিনী', দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।
৩. পাল সুদীপ্ত, 'সমকামিতা ও বিবর্তন', গুরুচণ্ডা৯, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২২।
৪. রায় অভিজিৎ, 'সমকামিতা', শুদ্ধস্বর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।